ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
**Impact factor: 4.5**
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1598-1608
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.06W.168**

# অর্থনৈতিক উন্নয়নে নাটোরের জমিদারদের ভূমিকা: প্রেক্ষিত রাজশাহী ও নাটোর জেলা

**মোঃ তৈয়বুর রহমান,** *পিএইচডি গবেষক, ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ*

Received: 25.07.2025; Accepted: 30.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract**

Natore is a small district situated in the northern part of Bangladesh. Natore was the subdivision of Rajshahi district and it was the district headquarters upto 1825. Many land lords lived in Natore. After the establishment of Zamindari, a new trend was created in the socio-economic activities of this area. The main job of Zamindars was revenue collection, that is related to economical activities during that time. The main objective of this article is to analyze the role of the Zamindars of Natore district in the field of economic sector in Rajshahi and Natore district. An attempt has been made to collect information through various books, journals, reports, thesises and interviews etc. While analyzing the role of the Zamindars in the field of economic sector, this article gives an idea about the economic condition in the contemporary times. This article attempts to provide details of the role of Natore Zamindars in economic development in Natore and Rajshahi district.

**Keywords:** Zamindar, Natore, Rajshahi, Economy, Role, Development

বাংলায় ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে রাজা বা রাজশাসন নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।[১] রাজশাসনের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলার জমিদারদের মধ্যে বরেন্দ্র অঞ্চলের নাটোরের জমিদাররা সুদীর্ঘকাল প্রভাব-প্রতিপত্তির সাথে তাদের জমিদারি পরিচালনা করে। জমিদাররা ভূমি থেকে সংগৃহীত রাজস্ব সংগ্রহ ও তার চুক্তি মোতাবেক উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা রাখার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জমিদাররা উন্নত চাষাবাদের ব্যবস্থা, কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ, কৃষি ফার্ম স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করতো। তবে তারা কৃষি ঋণ দিলেও কৃষকদের কাছ থেকে চড়া সুদ আদায় করতো। নাটোর জমিদারির অধিকাংশ এলাকা ছিল বরেন্দ্র অঞ্চলে। নাটোর জমিদাররা তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে নবাবের নিকট প্রেরণ করতো।[২] কৃষিকাজ থেকে উদ্বৃত্ত যে অর্থ পাওয়া যেত তা নবাবের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ব্যয়ভার বহন করা হতো। মুসলিম শাসনামলে বরেন্দ্র অঞ্চল বিভিন্ন জায়গা যেমন গৌড়, সোনার গাঁ, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি থেকে শাসিত হতে থাকে। ইসলাম প্রচারের ফলে গোটা বরেন্দ্র অঞ্চল মাত্র পাঁচশত বছরের মধ্যে মুসলমানদের প্রধান অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি পায়।[৩] মুসলমান শাসকরা ছিল বহিরাগত এবং তাদের প্রশাসন কাজ পরিচালনার জন্য হিন্দুদের সহযোগিতার প্রয়োজন হতো। বাংলার নবাবি আমলে মুর্শিদকুলি খানের শাসনের সময় হিন্দুদের জমিদারি কাজে নিয়োগের মাধ্যমে দিল্লী সম্রাটের অধিক রাজস্ব আদায়ের জন্য সুবিধা হয়।[৪]

[১] আবদুল মমিন চৌধুরী, “প্রাচীন বাংলার ভূমিব্যবস্থা,” মুনতাসীর মামুন সম্পা., *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালি সমাজ* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২), পৃ. ৩১।

[২]

[৩] আব্দুল্লাহ ফারুক, “বরেন্দ্রের অর্থনৈতিক ইতহাস,” মুহঃ মমতাজুর রহমান সম্পা. *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, রাজশাহী বিভাগঃ ইতিহাস-ঐতিহ্য* (রাজশাহী: বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ১৯৯৮), পৃ. ৮১৫।

[৪] তদেব, পৃ. ৮১৬।

মুর্শিদকুলি খানের সময় রাজস্ব ব্যবস্থার বড় সংস্কার করা হয়। এ সময় বাংলায় নতুন নতুন জমিদারির উদ্ভব ঘটে। মুর্শিদকুলি খানের দেওয়ান ছিলেন রঘুনন্দন। সে তার ভাই রামজীবনের নামে নাটোরের কানাইখালি মৌজা বানগাছি পরগনা বন্দোবস্তের মাধ্যমে নাটোর রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। নাটোর রাজবংশ থেকে আরো বেশ কিছু রাজবংশ তৈরি হয়। এছাড়াও নাটোরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ ছিল। এসব রাজবংশের অনেক জমিদার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। ইস্ট ইন্ডিয়া কেম্পানি কৃষির জন্য ইক্ষু, রেশম, নীল, পাট প্রভৃতি ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে বাংলাদেশের মাত্র এক তৃতীয়াংশ জমি চাষ করা হতো এবং দুই তৃতীয়াংশ পতিত থাকতো এবং খাজনা ছিল ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ।[৫] রাজস্ব ও খাজনা আদায় মূল দায়িত্ব হলেও জমিদাররা কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন। নাটোর কেন্দ্রিক জমিদাররা রাজশাহী ও নাটোর জেলায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেমন ভূমিকা রেখেছেন তা আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে।

## ভূমিব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব আদায়:

সভ্যতার শুরু থেকেই ভূমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভূমি ও ভূমির মালিকানা নিয়ে কালের পরিক্রমায় পরিবর্তন আসে। রাষ্ট্র ও রাজা ভূমির সাথে সম্পৃক্ত। প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে রাজা ভূমিকা রাখে ও প্রজাদের নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে কর সংগ্রহ করার নীতি গ্রহণ করে।[৬] মুঘল যুগে শেরশাহ শাসনামলে (১৫৩৯-৪৫) রাজস্ব ব্যবস্থায় নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। এ সময় দক্ষ ও অধিক বিজ্ঞান সম্মত রাজস্ব ব্যবস্থার প্রচল ঘটে। সম্রাট শেরশাহ তার অধীকৃত সমগ্র অঞ্চলকে রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার্থে সরকার ও পরগনায় বিভক্ত করেন। ১৫৮২ সালে আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী টোডরমল রাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে জরিপ করে নতুন রাজস্ব নির্ধারণ করেন। তিনি বাংলা সুবাকে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করে রাজস্ব নির্ধারণ করেন।[৭] নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময় রাজস্ব ব্যবস্থার এক বিরাট পরিবর্তন আসে। নবাব মুর্শিদকুলি খান ১৭০৪ থেকে ১৭২৫ সাল পর্যন্ত বাংলার দেওয়ান ও নবাব হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। এ সময় তার নতুন রাজস্ব নীতির ফলে নতুন জমিদারির উদ্ভব ঘটে।

নবাবি বাংলার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ক্ষেত্র ছিল ভূমি ও কৃষি। কৃষি ও ভূমি রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস ছিল। নবাবি বাংলার আর্থিক ভিত্তি তৈরি করতে এটি সহায়তা করে। বাংলার অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করার পর উৎপাদিত কৃষি পণ্যে একটা বড় অংশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া প্রেরণ করা হতো।[৮] রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য মুঘল ঐতিহ্য অনুসারে এ সময় আমলাতন্ত্র বা সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে এ সময় ভূমিকে খালিসা বা খাস জমি, জায়গির জমি এবং জমিদারি ভূমি এ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়।[৯] খালিসা বা খাস জমি থেকে প্রাপ্ত আয় সরকার ও নবাবদের ব্যক্তিগত আয় হিসেবে ধরা হতো এবং এ বিভাগ দেখভাল করা জন্য সরকার তার নিজস্ব কর্মচারী নিয়োগ করতো। দ্বিতীয় শ্রেণির জায়গির ভূমি সামরিক বা সৈন্যবাহিনীকে বেতনের পরিবর্তে প্রদান করা হতো। জায়গির ভূমি থেকে রাজস্ব সরকারি কোষাগারে অর্থ কম পরিমাণ গেলেও এর একটি গুরুত্ব ছিল। জায়গির ভূমি থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব দিয়ে সারা বছর ব্যয়ভার বহন করার পর যারা জায়গির ভোগী ছিলেন তার উদ্বৃত্ত অর্থ রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা দিতেন। জায়গির ভোগীরা এ সময় সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর একটা আলাদা প্রভাব বিস্তার করে। নবাবি বাংলায় তৃতীয় শ্রেণির ভূমি ছিল জমিদারদের নিয়ন্ত্রণে। ভূঅভিজাততন্ত্রের সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশ ছিল জমিদাররা। রাষ্ট্রের বিশাল একটা অংশে তারা প্রভাব বজায় রাখে। সরকার ও কৃষকের মাঝে জমিদাররা সেতুবন্ধনকারী হিসেবে কাজ করে।[১০] জমিদারগণ আওতাধীন এলাকার কৃষকদের রাজস্ব আদায় করে প্রতি বছর বৈশাখ মাসে রাজধানীর মুর্শিদাবাদে পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সরকারের সাথে বন্দোবস্ত অনুযায়ী রাজস্ব পরিশোধ করতেন।[১১] ভূমি রাজস্ব ছাড়াও জমিদাররা বিভিন্ন নামে রায়তদের নিকট থেকে সায়ের, আবওয়াব বা অতিরিক্ত কর আদায় করতেন। জমিদারদের প্রধান কাজ ছিল রায়তদের নিকট থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে তা সরাকরি কোষাগারে প্রদান করা। নবাবি বাংলায় রাজস্বের সিংহভাগ রাজস্ব আদায় করা হতো জমিদারদের মাধ্যমে।[১২] নবাবি বাংলায় শেঠতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। শেঠরাই

---

[৫] তদেব, পৃ.৮১৭

[৬] আবুল কালাম মোঃ যাকারিয়া, "বরেন্দ্রের অঞ্চলের ভূমি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা," মুহঃ মমতাজুর রহমান সম্পা. *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস,* পৃ. ৬৯।

[৭] তদেব, পৃ. ৭১২।

[৮] মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, *নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণি রাজনীতি সমাজ ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০২০), পৃ. ২৫৭।

[৯] তদেব, পৃ. ২৫৭।

[১০] তদেব, পৃ. ২৫৮।

[১১] তদেব।

[১২] তদেব, পৃ. ২৫৭।

সূলত অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতো। নবাব রাজধানী মুর্শিদাবাদে অবস্থান করতেন। সরকারি কোষাগার বা ব্যাংকিং ব্যবস্থার মত অর্থ ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠান নবাবরা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। শেঠরা তাদের ‘হাউস অব জগৎশেঠ’ নামীয় আর্থিক সংস্থার মাধ্যমে সরকারকে সহযোগিতা করতো।[১৩] সরকারের খাজাঞ্চিখানা হিসেবে জগৎশেঠের কুঠিগুলো ব্যবহার করা হতো। জমাকৃত রাজস্ব থেকে নবাবকে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদানের পর উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ দিল্লী সম্রাটের নিকট পাঠানো হতো। জমিদারদের উপর শেঠদের প্রভাব ছিল। সে সময়ই মূলত নাটোরের জমিদার রাজবংশের উৎপত্তি হয়।

ভূমি ও রাজস্ব আদায়ে নাটোরের জমিদারদের ভূমিকা ছিল। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে মুর্শিদকুলি খান তার অধীন সমস্ত এলাকাকে ৩৪টি সরকারের পরিবর্তে ১৩টি চাকলা ও ১৬৬০টি পরগনায় বিভক্ত করেন।[১৪] তার মধ্যে রাজশাহী চাকলা ছিল সর্ববৃহৎ।[১৫] এই রাজশাহী চাকলার জমিদার ছিলেন উদিত নারায়ণ। মুর্শিদকুলি খানের সময় তিনি রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হলে তার জমিদারি চলে যায়। তার জমিদারি পরবর্তীতে নাটোর রাজবংশের রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করা হয়। রাজশাহী জমিদারি নাটোরের জমিদারির অধীনে চলে যায়। জমিদারদের দায়িত্ব পালনের বিবরণ বাদশাহী সনদে উল্লেখ থাকতো। ১৭৩৫-৩৬ সালে রাজা রামকান্তকে রাজশাহী জমিদারি প্রদানের সনদে রাজকোষাগারে পেরিসকাস প্রদান এবং বাকি অংশ কিস্তিবন্দী অনুযায়ী বন্দোবস্ত করবেন এবং বছরের নির্দিষ্ট সময় অন্তর মুজুকরাত, নানকর প্রভৃতি আদায়ে বাধ্য থাকবেন।[১৬] এ সনদে রায়ত বা কৃষকদের সহযোগিতা এবং দেশের বৃহত্তর উন্নতি স্বার্থে কৃষির উন্নতিতে জমিদাররা ভূমিকা রাখবেন। দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ও কৃষি সমাজকে উন্নতির জন্য জমিদারদের উপর দায়িত্ব প্রদান করা হতো।[১৭] কৃষি যোগ্য জমি, অকৃষি যোগ্য জমি, বনাঞ্চল, জলাভূমি, ফলের বাগান, পুকুর দিঘি প্রভৃতি থেকে কর পাওয়া যেত। জমিদাররা মূলত মাল, সায়ের ও বাজে জমা এ তিন শ্রেণির উৎস থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করতো।[১৮] জমির খাজনা থেকে সংগৃহীত রাজস্বকে মাল বলা হতো। এটি ছিল মূল ভূমিকর। সায়ের বলতে যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে আদায়কৃত রাজস্ব, বাজারে মালামাল বিক্রয় ও নানা ধরনের শুল্ক সায়েরের অর্ন্তভুক্ত ছিল। তাছাড়া হাটবাজার, গঞ্জ, ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে আদায়কৃত অর্থ এর অর্ন্তভুক্ত ছিল।

এসব উৎস ছাড়া বিশেষ কোন দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত আরোপিত করকে বাজে জমা বলা হতো। বিভিন্ন ধরণের জরিমানা, পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ, বিবাহ ফি, প্রভৃতি বাজে জমার আওতায় ছিল।[১৯] রাণী ভবানী সুদীর্ঘকাল নাটোর জমিদারির নেতৃত্ব প্রদান করে খ্যাতি অর্জন করেন।[২০] ১৭৬৫ সালে ইংরেজরা মুঘল সম্রাট শাহ আলমের নিকট থেকে দেওয়ানি লাভ করে। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কোম্পানি নতুন নতুন রাজস্ব নীতি ঘোষণা করে। এ সময় রাজশাহী জমিদারি নাটোর রাজার ব্যক্তিগত জমিদারি হিসেবে কোম্পানির দেওয়ানি এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলার নবাবগণ ১৭৬৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার রাজস্ব আদায় করতে পারতেন। ১৭৬৫ সালের পর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা লাভ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দিল্লী নবাবকে প্রদানের বিনিময়ে মীরজাফরের মৃত্যুর পর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে।[২১] এ ক্ষমতা লাভ করে ইংরেজরা বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ে একক আধিপত্য লাভ করে। দিল্লী সম্রাট ইংরেজদের কাছে পুতুল শাসক হিসেবে পরিণত হয়। রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে সম্রাটের অর্থনৈতিক নির্ভশীলতা বেড়ে যায়। বাংলার নবাবি শাসন ব্যবস্থা অকেজো হয়ে নুতন ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণাধীন এক নতুন ধারার শাসনব্যবস্থা চালু হয় যেখানে অর্থনৈতিক পুরো নিয়ন্ত্রণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ইংরেজদের হাতে চলে যায়। কোম্পানি রাজস্ব আদায়ে সুবিধার জন্য এ দেশীয় দুজন ডেপুটি দেওয়ান নিযুক্ত করে। ডেপুটি দেওয়ানের অধীনে থেকে জমিদাররা রাজস্ব সংগ্রহ করতে থাকে। ইংরেজরা এ সময়কালে

---

[১৩] তদেব, পৃ. ২৫৮।

[১৪] চাকলাগুলো হল: ১. হুগলি, ২. হিজলী, ৩. মুর্শিদাবাদ, ৪. বন্দর বালেশ্বর, ৫. সাতগাঁও, ৬. ভূষণা, ৭. যশোহর, ৮. আকবর নগর, ৯. ঘোড়াঘাট, ১০. কুরিবারি, ১১. জাহাঙ্গীরনগর, ১২. শ্রীহট্ট ও ১৩. ইসলামবাদ। চাকলার প্রধানকে আমিল বলা হতো এবং উক্ত এলাকার রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি দায়ী থাকতেন।

[১৫] নুরুল ইসলাম খান, প্রধান সম্পাদক, *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর রাজশাহী জেলা* (ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ১৯৯১), পৃ. ৩৬৬।

[১৬] শিরিন আখতার, *সুবে বাংলার জমিদার ও জমিদারী,* সিদ্দিক মাহমুদুর রহমান অনূ. (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০১৮), পৃ. ৫০।

[১৭] তদেব, পৃ. ৫১।

[১৮] তদেব।

[১৯] তদেব, পৃ. ৫৪।

[২০] নুরুল ইসলাম খান, প্রধান সম্পাদক, *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর রাজশাহী জেলা* (ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ১৯৯১), পৃ. ৩৬৭।

[২১] S.M Ali, "Revenue History of Bangladesh," Administration Science Review (Dacca: NIPA, 1972), Vol. 3-4, p. 3-4; উদ্ধৃত, মোঃ মকসুদুর রহমান, *নাটোরের মহারাণী ভবানী* (ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৯), পৃ. ৬৯।

অধিক রাজস্ব আদায়ে নানা কৌশল অবলম্বন করে। অধিকহারে রাজস্ব আদায়ের জন্য শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ১৭৬৫ সালে কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর ইংরেজদের রাজস্ব আদায়ে নতুন নতুন কৌশল ও শাসননীতি নাটোরের রাণী ভবানীর জমিদারিতে প্রভাব ফেলে।[২২] ইস্ট ইন্ডিয়া নতুন নতুন রাজস্ব আদায় কৌশল জমিদার, কৃষক, ব্যবসায়ীসহ সবাই আক্রান্ত হয়। বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা চরম সংকটের মধ্যে পড়ে। এ সময় রাণী ভবানী প্রত্যক্ষভাবে রাজকীয় কোষাগারে রাজস্ব প্রদান করতেন।

১৭৬৫ সাল থেকে ১৭৭২ সাল পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ে দুজন নায়েবে দেওয়ান একজন সেতাব রায় ও আরেকজন রেজা খানই ছিলেন মূল রাজস্ব আদায়কারী। রেজা খান নাটোরের রাণী ভবানীর সাথে বাৎসরিক ২৪,৫১,০২২ (চব্বিশ লক্ষ একান্ন হাজার বাইশ) টাকাতে রাজশাহী জমিদারি বন্দোবস্ত করেন।[২৩] ডেপুটি দেওয়ানদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় ঠিকমত হচ্ছে না মনে করে কোম্পানি ১৭৬৬-৬৭ সালে বিভিন্ন জেলায় আমিল নিয়োগ করে কিন্তু রাজস্ব আদায়ে তারা অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। আমিলদারি ব্যবস্থার ফলে জমিদারি ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ১৭৬৯ সালে আমিলদারি ব্যবস্থার পরিবর্তে কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে বাংলায় বেশ কয়েকটি জেলায় গঠন করে সুপারভাইজার পদের সৃষ্টি করে। রানী ভবানীর সময়ে ১৭৬৬ থেকে ৭০ সাল পর্যন্ত বাৎসরিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ২৭,০২,০০০ (সাতাশ লাখ দুই হাজার টাকা)। কিন্ত রাণী ভবানীর বদান্যতা ও দানশীলতার কারণে ১৭৭৮-৭৯ সালে রাজস্বের পরিমাণ হয় ২২৮৬০০(বাইশ লাখ ছিয়াশি হাজার টাকা)। সেজন্য কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বভার নিজেই গ্রহণ করে।[২৪] ১৭৯০ সালে দশসনা বন্দোবস্তের মাধ্যেমে বার্ষিক সমগ্র জেলায় বার্ষিক ২৩,২৮,০০০ টাকা রাজস্ব নির্ধারণ করে নাটোর রাজা রামকৃষ্ণকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। কিন্ত রাজা রামকৃষ্ণ রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হলে জমিদারি খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। অনেক ভুঁইফোড়রা নতুনভাবে জমির মালিকানা লাভ করে।[২৫]

## কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নঃ

বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক দেশ। যুগযুগ ধরে বাংলার মানুষের প্রদান পেশা হলো কৃষি। কৃষিকে কেন্দ্র করে বাংলার অর্থনীতি পরিচালিত হয়ে থাকে। কৃষক ও কৃষি দুটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলায় কৃষি ও শিল্প হলো আর্থিক সম্পদের মূল উৎস। বাংলার অধিকাংশ স্থান প্লাবন সমভূমি। প্রাচ্যের শস্যাভাণ্ডার হিসেবে খ্যাত ছিল বাংলা।[২৬] বাংলার উত্তর ও উত্তরপূর্ব ও মধ্য অঞ্চল অসংখ্য নদনদী দিয়ে ঘেরা। বরেন্দ্র অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ জেলা নাটোর ও রাজশাহী। বরেন্দ্র অঞ্চলের মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। কৃষিই ছিল প্রধান আয়ের উৎস। নবাবি আমলে কৃষির উন্নয়নের সাথে জমিদাররা সম্পৃক্ত ছিল। রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি রায়তদের সুসংহত করে চাষাবাদে উৎসাহিত করা, অনাবাদী জমিকে চাষাবাদের আওতায় আনা, জলসেচ ও বাঁধের ব্যবস্থা করা এবং কৃষি পণ্যের সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ঘটানো জমিদারদের কর্তব্যে অর্ন্তভুক্ত ছিল।[২৭] সরকারি সনদে জমিদারদের এ দায়িত্বে কথা উল্লেখ থাকলেও জমিদাররা পুরোপুরি এ দায়িত্ব পালন করতো না। কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার বা কৃষিক ব্যাপক উন্নতি ঘটাতে তার ব্যর্থ হয়। কৃষকরা ছিল কৃষি উৎপাদনের মূল চালিকাশক্তি কিন্তু কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সেভাবে ঘটেনি। ফসলের ক্ষতি হলে খাজনা মওকুফ বা তাকাভি কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা হলেও দুর্যোগ পেরিয়ে গেলে ঋণ পরিশোধে বাধ্য করা হতো।[২৮] ফলে কৃষকরা সচ্ছল জীবনযাপন করতে পারেনি। রায়তদের সাথে জমিদারদের সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। কৃষকদের রক্ষা ও তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বাংলার সব জমিদারদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি। কোম্পানি দিওয়ানি লাভের পর জমিদারদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে জন্য বাংলায় সরকারি কালেক্টরের পদ সৃষ্টি করা হয়। বাংলায় জেলা সৃষ্টি করে জমিদারদের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নিয়ে নতুন ধারা সূচিত হয়। বরেন্দ্র অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে অসংখ্য জমিদার শ্রেণি কৃষি থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করেছে। কৃষকের নিকট থেকে খাজনা আদায়ে নির্যাতনের চিত্র পাওয়া যায় এবং এ অঞ্চলে বেশ কিছু কৃষক বিদ্রোহ সংঘঠিত হয়েছে। তারপরও জমিদার শ্রেণি ছিল মূলত জমির মালিক ও কৃষির প্রতি ছিল তাদের একচ্ছত্র প্রভাব। কৃষি জমি থেকে ছিল কৃষক ও রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস। উনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকে সরকার কৃষির উন্নয়নে মনোযোগ দেয় এবং বাংলার বিভিন্ন জেলায় কৃষি খামার প্রতিষ্ঠিত

---

[২২] মোঃ মকসুদুর রহমান, *নাটোরের মহারাণী ভবানী*, পৃ. ৬৯।

[২৩] তদেব, পৃ. ৭০।

[২৪] নুরুল ইসলাম খান, প্রধান সম্পাদক, *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর রাজশাহী জেলা* (ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ১৯৯১), পৃ. ৩৭৩।

[২৫] তদেব, পৃ. ৩৭৩।

[২৬] সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস* (কলকাতা: কে. পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানি, ১৯৫৮), পৃ. ৪৪।

[২৭] মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, *নবাবী বাংলার অভিজাত শ্রেণি রাজনীতি সমাজ ও সংস্কৃতি*, পৃ. ২৫৮।

[২৮] তদেব, পৃ. ২৫৯।

হতে থাকে।[২৯] খামারগুলোতে কৃষির উন্নতির জন্য নানা প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে থাকে। খামার স্থাপিত হলে কৃষকদের মাঝে উন্নত মানের বীজ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। খামারগুলোতে কৃষি পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। কৃষি জমিতে লোহার ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধীরে ধীরে কৃষি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে। হুগলি জেলার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখার্জি মডেল খামার প্রতিষ্ঠা করে কৃষি উন্নয়নের চেষ্টা করেন।[৩০] ১৮৬৫ সালে কৃষি বিজ্ঞানকে পাঠ্যক্রমে অর্ন্তভুক্ত করার জন্য তিনি সরকারকে অনুরোধ করেন। সরকার তার আহবানে সাড়া দিয়ে দু বছর পর কলকাতা নরমাল স্কুলে কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ে একটি পদ সৃষ্টি করেন। ১৮৭০ সালে ইউরোপীয় লাঙলের মত অনুরূপ লাঙল প্রচলন করে। ঢাকা, বাকেরগঞ্জ, ফরিদপুর, ও জলপাইগুড়িতে বরাকুল নামে একধরনের লোহার লাঙল প্রচলন করা হয় এবং লাঙল জমিদার, নীলকর ও ধনী কৃষকদের মাঝে বিক্রি করা হয়।[৩১]

১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর প্রদানের শর্তে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা লাভ করেন। কিন্ত রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা কোম্পানি নিজে গ্রহণ না করে দেশীয় লোকদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের সিদ্ধান্ত নেন।[৩২] নতুন রাজস্ব বন্দোবস্তে ইজারাদারি পদ্ধতি চালু করা হয়। এ সময় জমিদার রাণী ভবানী ইজারাদারদের প্রস্তাবের চেয়ে সুবিধাজনক প্রস্তাব দেয়া হয় এবং রাণীর সাথে পাঁচসলা বন্দোবস্ত করা হয়। রাণী ভবানী ইজারাদারদের প্রস্তাব ব্যর্থ করে নতুন করে রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন।[৩৩] নবাবি আমলের জমিদারদের সাথে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করেন। জমিদারদের সাথে হেস্টিংস পাঁচসলা জমি বন্দোবস্ত করেন। ব্রিটিশদের শাসনামলেও অর্থাৎ জমিদারি আমলে (১৭৯৩-১৯৪৭) পর্যন্ত বাংলার জীবন জীবিকার প্রধান মাধ্যম ছিল কৃষি। কৃষি জমি ছিল রাজস্ব আহরণের মূল উৎস। নাটোর ও রাজশাহী অঞ্চলে কৃষি হতে জমিদাররা বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আহরণ করতো। রাজস্ব আদায় করে তার সরকারের কাছে পাঠাতো এবং উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে অনেকেই তাদের নিজেদের উন্নয়ন এবং কৃষির উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।[৩৪] কৃষি ফার্ম স্থাপন, চাষাবাদের ব্যবস্থা, কৃষি ব্যাংক স্থাপন, এবং অনেক সময় কৃষকদের ঋণ প্রদান করা হতো।[৩৫] দিঘাপতিয়া জমিদার কুমার শরৎ কুমার রায় কৃষির উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। দয়ারামপুরে তিনি সাড়ে তিনশত বিঘা জমি নিয়ে উন্নত মানের কৃষি খামার স্থাপন করেন। কৃষি খামারটি ‘রাণী দ্রবময়ী ফার্ম’ নামে তার মায়ের নামে নামকরণ করেন।[৩৬] উন্নতমানের কৃষিকাজে এলাকাবাসী অনুপ্রাণিত করার জন্য তিনি কৃষি ফার্ম স্থাপন করেন। তিনি খামারটিকে উন্নতমানের আধুনিক খামার হিসেবে রূপদানের জন্য কৃষি বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞসম্পন্ন কর্মচারী নিয়োগ করেন। এই ফার্মটির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন একজন কৃষি বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ।[৩৭] এছাড়া গসিব সাহেব নামে এক ব্যক্তি ঢাকা থেকে এসে খামারে মাঝে মাঝে কৃষি বিষয়ে উপদেশ দিতেন। কুমার শরৎ কুমার তার পুত্র কুমার বিধুনাথকে কৃষি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রির জন্য আমেরিকা পাঠান। কুমার শরৎ কুমার নিজে সপ্তাহে দুইদিন হাতির পিঠে চড়ে কৃষি খামার পরিদর্শনে যেতেন এবং কৃষি বিষয়ে কর্মচারীদের উপদেশ প্রদান করতেন।[৩৮] বড়াল নদী থেকে দীর্ঘ নালা কেটে কৃষিক্ষেতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও তিনি রাণী দ্রবময়ী ফার্মের অধীনে একটি গোবর্ধন ফার্ম স্থাপন করেন।[৩৯] সেখানে তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে উন্নত জাতের গরু ও ভাগলপুর থেকে ষাঁড় সংগ্রহ করেন। শরৎ কুমার দয়ারামপুরে একটি হাঁসমুরগিরও একটি ফার্ম স্থাপন করেন। এই ফার্মে তিনি সমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী নামে একজন ব্যক্তিকে লক্ষ্ণৌ থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়ে আসেন।[৪০] শরৎ কুমার দয়ারামপুরে একটি চিনিকল স্থাপন করেন। এখানে তিনি আখ মাড়াইয়ের ব্যবস্থা করেন। এর পরে গোপালপুরে নর্থবেঙ্গল চিনিকল স্থাপিত হয়।

---

[২৯] ওয়াজেদ আলী, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস ১৭৫৭-১৯৪৭* (ঢাকা: তাম্রলিপি প্রকাশ, ২০১১), পৃ. ৪৯।

[৩০] তদেব, পৃ. ৫০।

[৩১] তদেব, পৃ. ৫২।

[৩২] তদেব, পৃ. ৩১।

[৩৩] তদেব, প. ৩২।

[৩৪] মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ‘‘জমিদারী প্রথা ও সমাজ উন্নয়ন: রাজশাহী জমিদারদের উদাহরণ’’, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬, পৃ. ১৭৮।

[৩৫] তদেব, পৃ. ১৭৮।

[৩৬] এসএম আব্দুল লতিফ, ‘বরেন্দ্রভূমির কৃতি সন্তানঃ কুমার শরৎ কুমার’, শামসুল হক কোরায়শী, সম্পা. *শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থঃ ১৯৮৪* (রাজশাহী: রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার, ১৯৮৪), পৃ.২৩।

[৩৭] তদেব, পৃ. ২৩।

[৩৮] তদেব,পৃ. ২৪।

[৩৯] তদেব।

[৪০] তদেব।

## যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমিকাঃ

অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই গুরুত্ব বহন করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। জমিদারি ব্যবস্থায় যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিককালের মত এতটা উন্নত ছিল না। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় অসংখ্য নদীনালা প্রবাহিত হয়েছে। বাংলার ভূখণ্ডে অনেক ছোটবড় নদী জালের মত ছড়িয়ে আছে। নদীপথই ছিল তৎকালীন সময়ে যোগাযোগের মূল মাধ্যম। এছাড়া মাটির পথ সবাই ব্যবহার করতো। ১৮৭৬ সালে রেলপথ বাংলায় প্রথমবারের মত চালু হয়। এ রেলপথ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। ব্রিটিশরা তাদের মালামাল ও পণ্যদ্রব্য সহজে একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে রেলপথ আবিষ্কার করে। এ রেলপথ আবিষ্কারের ফলে বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যপক প্রভাব ফেলে। ব্রিটিশ শাসনামলে যোগাযোগ ব্যবস্থা মূলত ছিল নৌপথ। রাস্তাঘাট ছিল খুবই কম। উপমহাদেশে রেলপথ তৈরি করা হয় ১৮৭৬ সালে। পরবর্তীকালে বাংলায় বিভিন্ন সময়ে রেলপথের বিস্তার ঘটে। আধুনিক কালে যে সমস্ত রাস্তাঘাট লক্ষ্য করা যায় তার অধিকাংশ অষ্টাদশ শতকে নির্মিত। ১৯১২-১৯২২ সালে সার্ভে এ্যাণ্ড সেটেলমেন্ট অপারেশনে ফাইনাল রিপোর্টে যে রাস্তাগুলোর অস্তিত্ব আছে সেগুলো ১৭৭০ সালে প্রকাশিত রেনেলের ম্যাপের অনুরূপ।[৪১] রাজশাহী ও নাটোরে অনেক রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে জমিদাররা ভূমিকা রাখে। জমিদাররা তাদের চলাচলের জন্য এবং রাজবাড়ির সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য রাস্তা নির্মাণ করে। তবে জলপথেই তাদের যাতায়াত বেশি ছিল। বর্তমান সময়ের অনেক রাস্তা জমিদারদের সময়ে রাস্তার উপর নির্মিত হয়েছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল করেছে। তাই প্রাথমিক অবস্থায় তৈরি করা সে রাস্তাগুলো অত্র এলাকার আর্থ-সামজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। অর্ধবঙ্গেশ্বরী খ্যাত রাণী ভবানী অনেক রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। নাটোর থেকে বগুড়ার ভবানীপুর পর্যন্ত ৩০ মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা নির্মাণ করেন।[৪২] এটি রাণী ভবানীর জাঙ্গাল[৪৩] নামে পরিচিত। রাস্তাটি মূলত একটি বাঁধের উপর নির্মিত রাস্তা। সিংড়া উপজেলার চৌগ্রামের দুই মাইল উত্তরে জামতলী নামক জায়গা থেকে রাস্তাটি সোজা পূর্বদিকে বগুড়া জেলার ভবানিপুরের দিকে গিয়েছে। তৎকালীন সময়ে রাস্তাটির গুরুত্ব ছিল অত্যাধিক। এই রাস্তার দুই পাশে পথিকদের সুবিধার জন্য অনেকগুলো বৃক্ষ রোপণ করা হয় এবং রাস্তার পাশে অনেকগুলো পুকুর খনন করা হয়। এই রাস্তার উপর বেশ কয়েকটি পুল নির্মাণ করা হয়। তার মধ্যে বিল গ্রামের পুলটি ১৫২ হাত দীর্ঘ ও ২০ হাত প্রস্থ। সেতুটি তিনটি খিলানের উপর দণ্ডায়মান।[৪৪] মধ্যকার খিলানটি উঁচু হওয়ায় বর্ষাকালে সহজেই নৌকা যাতায়াত করতে পারতো। রানী ভবানী তালম শিব মন্দির পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণে অর্থ সহায়তা করেন। ১৮৫০ সালে রাজা প্রসন্ননাথ নাটোর শহর থেকে দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি হয়ে নাটোর বগুড়া সড়কের সঙ্গে সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য ৩৫০০০(পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা) দান করেন।[৪৫] নাটোর মহকুমার সবচেয়ে পুরনো পথ হলো রামপুর বোয়ালিয়া থেকে নাটোরের মধ্য দিয়ে বগুড়া পর্যন্ত বিস্তৃত সড়কটি। নাটোর-রাজশাহী সড়কটি রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য জেলার সাথে রাজশাহীর যোগাযোগ স্থাপনে ভূমিকা রাখছে। রাস্তাটির দুপাশে বৃক্ষ রোপণ করে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। এ সড়কটি ডিব্রুগড় থেকে রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত আসামের ট্রাঙ্ক রোডের শাখা। এই রাস্তাটি দৈর্ঘ্য ৫৬৪ মাইল এবং এটি নন্দীগ্রাম, চৌগ্রাম, রণবাঘা, সিংড়া, শেরকোল, বাকসর ও দিঘাপতিয়ার পাশ দিয়ে চলে গেছে।[৪৬] ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে জেলখানার কয়েদী দ্বারা নাটোর-রাজশাহী সড়ক সংস্কার করা হয় এবং পরবর্তীকালে দিঘাপতিয়া রাজার অর্থ সাহায্যে এটিকে প্রশস্ত ও আরো সংস্কার করা হয়।[৪৭] নাটোর ছোট তরফের রাণী হেমাঙ্গিনী দেবী নাটোর কাছারি রোডে একটি লোহার পুল নির্মাণ করেন।[৪৮] এ পুলটি নারদ নদের উপর নির্মাণ করা হয়। এটি উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৩০ ফুট লম্বা ও পূর্ব পশ্চিমে প্রায় ৮ ফুট প্রস্থ ছিল। পুলটি নির্মাণের ফলে নদীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের সাথে সহজে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পুলটি দীর্ঘকাল টিকে ছিল তবে বর্তমানে সেখানে আধুনিক কংক্রিটের সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। নাটোরের নিকটবর্তী ধরাইল জমিদারদের বসবাস ছিল। ধরাইল জমিদাররা ধরাইল জমিদার বাড়ি হতে নাটোর শহর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ

---

[৪১] নুরুল ইসলাম খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।

[৪২] মো. মাহবুবর রহমান, "ব্রিটিশ আমলে রাজশাহী জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জেলার জমিদারদের ভূমিকা," মাহমুদ জামান কাদেরী ও অন্যান্য(সম্পা), *পরম্পরা* (রাজশাহীঃ হেরিটেজ রাজশাহী, ২০০৭), পৃ. ৬৩।

[৪৩] জাঙ্গাল রাস্তা বা সেতু অর্থে ব্যবহৃত হয়।

[৪৪] মো. মাহবুবর রহমান, "ব্রিটিশ আমলে রাজশাহী জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জেলার জমিদারদের ভূমিকা,"পৃ. ৬৩।

[৪৫] তদেব।

[৪৬] বিমল প্রসাদ রায়, প্রতুলপতি লাহিড়ী ও নির্মল চন্দ্র বিশি, *নাটোরের কথা ও কাহিনী* (কলিকাতা: নাটোর মহকুমা সম্মিলনী, ১৯৮১), পৃ. ৩৩।

[৪৭] তদেব, পৃ. ৩৩।

[৪৮] মো. মাহবুবর রহমান, "ব্রিটিশ আমলে রাজশাহী জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জেলার জমিদারদের ভূমিকা," পৃ. ৬৩।

করেন। নাটোর থেকে রাজশাহী চলাচলের জন্য মোটর বাসের ব্যবস্থা ছিল। ১৮৭৬ সালে উত্তরবঙ্গ রাজ্যের সাথে রেলপথ নির্মাণের জন্য নির্দেশনা জারি করে। ঐ রেলপথ পূর্ববঙ্গ রেলপথের কুষ্টিয়া জেলার পোড়াদহ থেকে নাটোরের উপর দিয়ে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮৭৮ সালে পোড়াদহ থেকে ভেড়ামাড়া পর্যন্ত রেললাইন উদ্বোধন করা হয় এবং একই বছর নাটোর হয়ে সান্তাহার পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ করা হয়।[৪৯] নাটোরসহ অন্যান্য স্থানের লোকজন রেলগাড়ি চেপে সাড়া ঘাট হয়ে নৌকা বা লঞ্চ হয়ে পদ্মা পাড় হয়ে কলকাতা যেত। ১৯১৫ সালে পদ্মা নদীর উপর হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নির্মিত হলে কোলকাতা ও দার্জিলিংয়ের সাথে যোগাযোগ ব্যস্থার নতুন গতি পায়। ১৯১৬ সালে জেলাবোর্ডের রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় ৯২৮ মাইল গ্রামের রাস্তা ছাড়া ৫০৫ মাইল কাঁচা রাস্তা এবং ৪৫ মাইল পাকা রাস্তা ছিল। নাটোর মহকুমায় উল্লেখ যোগ্য রাস্তাগুলো হলো:[৫০]

| ক্রমিক নং | রাস্তার নাম | মোট দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|
| ০১. | নাটোর-বাগাতিপাড়া | ১২ মাইল |
| ০২. | নাটোর-তাহিরপুর | ১০ মাইল |
| ০৩. | নাটোর-হালসা | ৪ মাইল |
| ০৪. | নাটোর -নলডাঙ্গা | ৯ মাইল |
| ০৫. | আহমেদপুর-বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর | ১৬ মাইল |
| ০৬. | লালপুর-বনপাড়া | ১২ মাইল |
| ০৭. | মালঞ্চি-দয়ারামপুর | ৪.৫ মাইল |
| ০৮. | নাটোর-বগুড়া রাস্তা | ২ মাইল |
| ০৯. | নাটোর-ধুপইল | ৫ মাইল |
| ১০. | দিঘাপতিয়া-হাপানিয়া | ৪ মাইল |
| ১১. | গোবিন্দপুর-বিলদহ | ১২ মাইল |

এ সমস্ত রাস্তাগুলোর নির্মাণের সাথে জমিদারদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তা রয়েছে। জমিদারদের সময়ে রাস্তাগুলোর অস্তিত্ব ছিল এবং জমিদাররা এ সমস্ত রাস্তা নির্মাণে নানাভাবে সহায়তা করেছে।[৫১] ১৮৭১ সালে রাজশাহীতে ১৭৯ মাইল দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ছিল। সেগুলো হল:[৫২]

| ক্রমিক নং | রাস্তার নাম | মোট দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|
| ০১ | রাজশাহী শহর এলাকা ও রামপুর-বোয়ালিয়া | ৯ মাইল |
| ০২ | রামপুর- বোয়ালিয়া -নাটোর রোড | ৩১ মাইল |
| ০৩ | নাটোর-আত্রাই রোড | ৬ মাইল |
| ০৪ | নাটোর-লালপুর রোড | ২০ মাইল |
| ০৫ | রামপুর- বোয়ালিয়া- নওহাটা রোড | ১০ মাইল |
| ০৬ | রামপুর-বোয়ালিয়া বরগাছি রোড | ১৪ মাইল |
| ০৭ | নাটোর -দাদাপুর রোড | ২৯ মাইল |
| ০৮ | বরগাছি ও দিনাজপুর রোড | ২৯ মাইল |

দিঘাপতিয়া জমিদারের একটি অংশ নাটোরের দয়ারামপুরে অবস্থান করতো। এ বংশের কুমার শরৎ কুমার এই এলাকায় রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। এই এলাকার রাস্তাঘাট নির্মাণে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। মালঞ্চি রেল স্টেশনে তিনি নিজ ব্যয়ে প্রতম শ্রেণির একটি বিশ্রামাগার স্থাপন করেন।[৫৩]

[৪৯] তদেব, পৃ. ৩৮।

[৫০] নুরুল ইসলাম খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।

[৫১] মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ''জমিদারী প্রথা ও সমাজ উন্নয়ন: রাজশাহী জমিদারদের উদাহরণ,'' পৃ. ১৮৭।

[৫২] তদেব,পৃ. ১৮৬।

[৫৩] এসএম আব্দুল লতিফ, 'বরেন্দ্রভূমির কৃতি সন্তানঃ কুমার শরৎ কুমার', প্রাগুক্ত, পৃ.২৪।

## নগরায়ণে ভূমিকাঃ

নাটোরে যখন জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন স্থানটি ছিল একটি বিলময় এলাকা। স্থানটি তখন ভাতঝরার বিল বা ছাইভাঙ্গার বিল নামে অভিহি হতো। কিন্তু নাটোর জমিদারের রামজীবনের মাধ্যমে যখন এখানে রাজবাড়ি নির্মাণ করা হয় হয় তখন এর আশপাশে জমিদারদের কর্মচারী, পেয়াদা , গোমস্থারা বসবাস শুরু করে। ধীরে ধীরে শহরের অন্যান্য জায়গা থেকেও সাধারণ জনগণ এসে বসবাস করতে থাকে। নাটোর জায়গাটি এক সময় প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে।

নাটোর রাজবংশ নাটোরকে তাঁদের জমিদারির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলে এবং ১৭১০ সালে শহর হিসেবে নাটোর আত্মপ্রকাশ করে।[৫৪] রাণী ভবানীর শাসনকালে নাটোরকে কেন্দ্র করে সমগ্র উত্তরবঙ্গ শাসনাধীন ছিল। নাটোরে রাজাজমিদারদের বসবাস হওয়ায় অনেক জনগোষ্ঠী নাটোরে আশপাশে এসে বসবাস শুরু করে। মুর্শিদাবাদের পতন কালে সেখান থেকে অনেক লোক পদ্মা পাড় হয়ে নাটোর ও আশপাশে বসবাস শুরু করে। সুরক্ষা ও নিরাপত্তার কথা ভেবে তারা এখানে স্থাপনা শুরু করে এবং নাটোরে জনসংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়।[৫৫] এ সকল জনগোষ্ঠীর নিত্যপ্রয়োনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য অসংখ্য দোকানপাট নির্মিত হতে থাকে। নাটোরে রাজ বসতি হওয়ার কারণেই মূলত এখানে নগরায়ণের বিকাশ ঘটে। জমির উপর নির্ভরশীল জমিদার, জোতদার, তালুকদার, ইত্যাদি জনগণ নাটোরেই মূলত অবস্থান করতেন। ধীরে ধীরে নাটোর বাসী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। নাটোর জমিদাররা পরবর্তী কালে কলকাতা কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। জমিদাররা নাটোরের বিকাশে তেমন আগ্রহী হয়ে ওঠে নি। নাটোরের রাস্তাঘাট, নারদ নদের উপর সেতু নির্মাণ, হাসপাতাল, স্কুল, অধিকাংশ স্থাপনে দিঘাপতিয়া জমিদাররা বেশি ভূমিকা রাখতে থাকে। নাটোর, দিঘাপতিয়া ও পুঠিয়া এ তিনটি রাজবংশ পাশাপশি হওয়ায় নাটোরে শিল্পদ্রব্যে ক্রেতা পাওয়া গেলেও সীমিত আকারে শিল্প সমৃদ্ধি ঘটে।[৫৬]

## ব্যবসা বাণিজ্য ও হাটবাজারের সুবিধা সৃষ্টিতে ভূমিকাঃ

কৃষিজ ও শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদনের সাথে ব্যবসাা বাণিজ্যের সম্পর্ক থাকে। বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজার ও বানিজ্যে ছিল অনেক বড়। নবাবি বাংলায় মুর্শিদাবাদের কাছে ভগবানবিলাস এবং ঢাকার কাছে রাজনগন ছিল অভ্যন্তরীণ বাজারের বড় ঘাঁটি। নারায়ণগঞ্জ, বর্ধমান, নাটোরের ভবানীগঞ্জ, শিবগঞ্জ, স্বরূপগঞ্জ, কলকাতার শোভাবাজার, বাগবাজার, হাটখোলা বাজার, চার্লস বাজার, বেগম বাজার ও নয়াবাজার ছিল অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র।[৫৭] এর বাইরেও অনেক বাজার ও গঞ্জ ছিল। এসব বাজার পরিচালনা ও তদারকিতে ভূঅভিজাত জমিদার গোষ্ঠীর ভূমিকা ছিল। বিভিন্ন জিনিসপত্রের গুণগত মান যাচাই, মূল্য ও ওজন পরিমাপে জন্য সরকারির কর্মচারীর পাশাপাশি স্থানীয় জমিদাররা তদারকি করতো।[৫৮] জমিদারগণ ভূমিরাজস্ব ছাড়াও সড়ক, সীমান্ত ও ফেরির জন্য ব্যবসায়ীদের ভূমি বা আবাস্থলের ওপর ব্যবসায়ীক কর আদায় করতেন। জমিদারদের সময়ে গ্রামীণ হাটবাজার সৃষ্টির তথ্য পাওয়া যায়। অধিকাংশ হাটবাজার তৈরি হয় নদী তীরবর্তী স্থানে ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বড় বটগাছের নিচে হাট বসতো। জমিদারদের তার অধীন এলাকায় হাটবাজার ও মেলার আয়োজন করা হতো। জমিদারদের আায়ের একটা উৎস ছিল এ সমস্ত হাটবাজার।[৫৯] হাটবাজার তৎকালীন সময়ে ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসারে ভূমিকা রাখতো। সপ্তাহের নির্দিষ্ট একটা দিনে হাট বসতো। গ্রামীণ লোকজন এ সকল হাটবাজারে কৃষিপণ্য ও অন্যান্য দৈনন্দিন জিনিসপত্র বিক্রি করতো। জমিদারদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে হাট বসতো। গ্রামীণ পণ্য ও তরিতরকারি এসব হাটবাজারগুলোতে নিয়ে আসা হতো। স্থানীয় জমিদারগণ এ সকল হাটবাজার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতো। নিজ নিজ জমিদারি এলাকায় হাটবাজার বসিয়ে জমিদাররা খাজনা আদায় করতো।[৬০] অনেক সময় জমিদাররা প্রতিযোগিতা করে হাট বসাতো। কৃষক ও স্থানীয় জনসাধারণ হাটে পসরা সাজিয়ে পন্য নিয়ে বসতো। অর্থনৈতিক কাযক্রমে এ সকল হাটবাজার ভূমিকা রাখে। কালের পরিক্রমায় এ সকল হাটবাজার আরো বিস্তৃতি ও বিখ্যাত হয়ে ওঠে। হাট বাজারকে কেন্দ্র করে ছোট আকৃতির শহর গড়ে ওঠে এবং হাটবাজারের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। হাটবাজারে সহজে পণ্যদ্রব্য পাওয়া যেত বলে এর আশপাশে জনবসতি গড়ে ওঠে ও দ্রুত বিস্তার ঘটে। রামপুর বোয়ালিয়া, নাটোর, সরদহ, চারঘাট, পুঁঠিয়া, দিঘাপতিয়া, হাতিয়ান্দহ, কলম, প্রভৃতি স্থানে দৈনিক বাজার বসতো।[৬১]

---

[৫৪] জয়ন্ত কুমার রায় ও ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, *উত্তরবঙ্গের নগরায়ণ নাটোর* (ঢাকাঃ অনন্যা প্রকাশ, ২০০৬), পৃ. ৪৮।

[৫৫] তদেব, পৃ. ৪৮।

[৫৬] তদেব, পৃ. ৫০।

[৫৭] মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহামন খান, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৬৬।

[৫৮] তদেব।

[৫৯] মো. মাহবুবর রহমান, "ব্রিটিশ আমলে রাজশাহী জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জেলার জমিদারদের ভূমিকা," পৃ. ৬৪।

[৬০] মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ''জমিদারী প্রথা ও সমাজ উন্নয়নঃ রাজশাহী জমিদারদের উদাহরণ," পৃ. ১৮২।

[৬১] কালীনাথ চৌধুরী, রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং রাজশাহী পরিচিতি (ঢাকাঃ গতিধারা প্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ২০।

জমিদারদের সময়ে এমন অনেক হাটবাজার তৈরি হয়। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে রাজশাহীতে তেমন বড় আকৃতির হাটবাজার গড়ে ওঠে নি। রাজশাহীর বিভিন্ন জায়গায় গ্রামকেন্দ্রিক বাজার বন্দর গড়ে ওঠে যেমন বাঘা, মীরগঞ্জ, তাহেরপুর, নাটোর, প্রেমতলী প্রভৃতি।[৬২] এ সকল হাট বাজারের মধ্যে দিঘাপতিয়া ছিল অন্যতম পুরনো একটি বাজার। এ বাজার সৃষ্টিতে মূলত দিঘাপতিয়া জমিদাররা বেশি ভূমিকা রাখে। নাটোর রাজশাহী যে রাস্তা যেটি নির্মাণে দিঘাপতিয়া জমিদারদের ভূমিকা আছে তার পাশে ঝলমলিয়া ও পুঠিয়া বাজার তৈরিতে জমিদারদের ভূমিকা রয়েছে। দিঘাপতিয়া জমিদারদের একটি অংশ নাটোরের দক্ষিণে দয়ারামপুর নামক স্থানে বসবাস শুরু করে। স্থানটি ছিল নন্দকুজা নদীর তীরে। এখানে দয়ারাম পুর বাজার গড়ে ওঠে। এ বাজারকে কেন্দ্র করে এখানে পণ্য কেনা বেচা হতো। স্থানটি আশপাশের সাধারণ জনগণের জন্য ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বর্তমানে কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট অবস্থান এখানে এবং দয়ারামপুর স্থানটি গ্রামের মধ্যে হলেও শহরের আবহ বিরাজ করছে। নাটোর বড়াইগ্রাম উপজেলার জোয়ারিতে বিখ্যাত বিশি পরিবারের বসবাস ছিল। বিশি পরিবার জোয়ারি বাজার সৃষ্টি করেন। বিশি পরিবারের রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী স্থানে এ বাজারটি অবস্থিত। রাজশাহীর জেলার বিভিন্ন স্থান চলনবিল ও উত্তরাঞ্চল থেকে বিভিন্ন কৃষি পণ্য রামপুর বোয়ালিয়াতে আসতো এবং দেশী বিদেশী বণিকগণ এগুলো জাহাজ বোঝাই করে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আফ্রিকায় নিয়ে যেত।[৬৩] ১৭৫৯ সালে মি. হলওয়েল এক রিপোর্টে উল্লেখ করেন কেবল নাটোর থেকে ৬ প্রকারের বস্ত্র ও কাঁচা রেশম ইউরোপে যেত।[৬৪] উনিশ শতকের শেষার্ধে মেসার্স রবার্ট ওয়াটসন কোম্পানি তাদের সবগুলো কুঠি ও সম্পত্তি মেদিনীপুর জমিদারি নিকট বিক্রি করেন। এই কোম্পানির ম্যানেজার ছিলেন মি. অষ্টিন তিনি শিরইলের জমিদার বাবু ভবানী চরণের পূর্বপুরুষের নিকট থেকে বার্ষিক সাতশত টাকা দিয়ে বর্তমানে সাহেব বাজারের পূর্ব দিকে একটি একতলা ভবন নির্মাণ করেন এবং এভাবে সাহেব বাজার প্রতিষ্ঠা পায়।[৬৫] এভাবে ধীরে ধীরে দেশের বিভন্ন স্থান থেকে ব্যবসায়ীরা এসে সাহেব বাজারে ব্যবসা করতে থাকেন ও সাহেব বাজারের বিস্তৃতি ঘটে। রামপুর বোয়ালিয়ার আদি স্থান রেশমপট্টি, রাণীবাজার, শিরইল, টিকাপাড়া, বোসপাড়া, রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি এলাকায় মাড়োয়ারী, হিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী, উকিল, শিক্ষক, ডাক্তারসহ বিভিন্ন পেশাজীবি বসবাস করা শুরু করে।[৬৬] বিশ শতকের শুরুতে মেদিনীপুর জমিদারির রাজশাহী অঞ্চলের ম্যানেজার মি. অস্টিনের সহায়তায় সাহেব বাজার ও পুঠিয়া রাণী হেমন্ত কুমারীর প্রচেষ্টায় রাণীবাজার গড়ে ওঠে।[৬৭]

## কর সংগ্রহে ভূমিকা:

জমিদাররা নির্ধারিত কর ছাড়াও অতিরিক্ত অনেক ধরণের কর আদায় করতো। নজরানা, আবওয়াব, পথকর প্রভৃতি আদায় করতো। কিন্তু অধিকাংশ তাঁরা নিজেদের কাছে রাখতো ও তাদের নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতো। স্থানীয় সরকারের প্রধান হিসেবে জমিদাররা নিয়মিত খাজনা আদায়ের পাশাপাশি অন্যান্য কর সংগ্রহ করতো। আদায়কৃত রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ রেখে বাকিগুলো কেন্দ্রে পাঠাতো। ঘাট বা চৌকি এবং হাট খাজনার মতো এ খাজনাগুলো নির্ধারণ কর হতো। জমিদারগণ আয় বৃদ্ধির জন্য হাট, বাজার বা গঞ্জে সরকারি শুল্ককেন্দ্র স্থাপন করতো এবং নিজস্বকেন্দ্র স্থাপন করতো। তাদের নিজস্ব কর্মচারী বাজারে খাজনা নির্ধারণ করতো, ওজন, পরিমাপ এবং বিক্রিত মালামালের মান পরীক্ষা করতো।[৬৮] হাট ও খাজনার দায়িত্বে যে সকল জমিদার থাকতো তাদের খাজনা দিতে হতো তবে যে স্থানে বাজার বা শুল্ক আদায় কেন্দ্র স্থাপন করা হতো সেস্থানের খাজনা মওকুফ করে দেওয়া হতো।

## দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণ:

১৭৭০ সালে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয় যেটি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। এটি ১১৭৬ বঙ্গাব্দে হয়েছিল বলে তা বলা হয়। এ সময় মানুষ খাদ্যাভাবে গাছের পাতা ও ঘাস খেয়ে জীবন ধারনের চেষ্টা করে। হাজার হাজার মানুষ প্রতিয়িত মৃত্যুবরণ করতে থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কড়া রাজস্ব আদায়ের নীতি ও খরার কারণে এ দুর্ভিক্ষ হয়। ইংরেজ কর্মকর্তা কর্মচারীদের দুর্নীতি এ দুর্ভিক্ষের জন্য অনেকটা দায়ী। এ সময় ইংরেজ কোম্পানির লোকজন দব্যমূল্যের দাম কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে দেয়। ইংরেজ গোমস্তাদের অত্যাচারে অনেকে পালিয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোক এ দুর্ভিক্ষে মারা

---

[৬২] মাহবুব সিদ্দিকী, *শহর রাজশাহীর আদিপর্ব* (ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী, ২০১৩), পৃ. ৫০।

[৬৩] তদেব, পৃ. ৫০।

[৬৪] তদেব।

[৬৫] তদেব, পৃ. ৫১।

[৬৬] তদেব, পৃ. ৫১।

[৬৭] তদেব, পৃ. ৫২।

[৬৮] শিরিন আখতার, “নবাবি আমলে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমিভিত্তিক সমাজ” সিরাজুল ইসলাম সম্পা. *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, তৃতীয় খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০২১), পৃ. ৩৫।

যায়। ১৭৭০ সালের দুভিক্ষে অনেক জমিদার তাদের খাজনা প্রদানে ব্যর্থ হয়ে জমিদারি চলে যায়। রাণীভবানীর জমিদারির উপর এর ব্যপক প্রভাব পড়ে। কিন্তু রাণী ভবানী দক্ষতার সাথে এ দুর্যোগ মোকাবেলা করার প্রয়াস চালান। এ সময় রাণী ভবানীর জমিদারি টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রজাদের রক্ষার্থে রাণী ভবানী এগিয়ে আসেন। তিনি উজাড় করে তাঁর রাজভান্ডার থেকে সহায়তা করতে থাকেন। জনগণের কষ্ট লাঘবের জন্য তিনি দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ থেকে চাল ক্রয় করে জনগণকে প্রদান করেন।[৬৯]

## কুটিরশিল্প স্থাপনঃ

নাটোরে জমিদারদের মাধ্যমে কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটে। চিনি, রেশম, পিতল, কাঁসার জন্য নাটোরের সুখ্যাতি ছিল। নাটোরের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল কলম। কলম গ্রামটি নদী তীরবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে জমিদারদের বসবাস ছিল। কাঁসা ও পিতলের জিনিস তৈরির জন্য কলম খ্যাতি অর্জন করে। কলম ছিল একটি ব্যবসায়ীক কেন্দ্র। এখানে জমিদার জোতদার, মহাজন, মৃৎশিল্পী, লৌহ শিল্পী, স্বর্ণশিল্পী, চিত্রকর প্রভৃতি শ্রেণি পেশার মানুষ বসবাস করতো।[৭০] এখানে দৈনিক বাজারে নানা প্রকার তৈজসপত্র ক্রয়বিক্রয় করা হতো। বর্ষাকালে নদীপথে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়িসহ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে শাল কাঠ আনা হতো। মৈত্র জমিদারদের বসবাস হওয়ার কারণে কলম গ্রাম সমসাময়িক সময়ে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমে এগিয়ে ছিল।[৭১] নাটোরের জমিদারদের মধ্যে অনেকে সৌখিন ছিলেন। তাঁরা জমিদারি পরিচালনার সাথে অনেক ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশে ভূমিকা রাখেন। এ ক্ষেত্রে দিঘাপতিয়া জমিদার প্রমথনাথের কথা জানা যায়। রাজা প্রমথনাথ দুইজন শিল্পীকে মুর্শিদাবাদ থেকে নিয়ে আসেন। তাদের দুজনের নাম ছিল মথুর ও রামেশ্বর। তারা দিঘাপতিয়া বাসভবনে হাতির দাঁতের কারখানা চালু করেন। অধিকাংশ জমিদার বিলাসী ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করেন। এরফলে স্থানীয় হস্ত শিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্প প্রসার লাভ করে। জমিদার ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাছে সূক্ষ্ম সুতি ও ও রেশমের চাহিদা ছিল। তাদের প্রাসাদ ও আঙ্গিনায় অলঙ্ককার ও অলঙ্কৃত বস্ত্র শিল্পের প্রসার ঘটে। নদীয়ার বুররান ও শান্তিপুর অঞ্চলের সূক্ষ্ম তুলা ও রেশম শিল্পে নদীয়ার রাজা পৃষ্ঠপোষকতা করে। ঘোড়াঘাট, সন্তোষ ও দিনাজপুরের জমিদারদের বুদ্দল এলাকার মলমল, সাননো, আর তাজীব উল্লেখযোগ্য। হিন্দুস্থানের রপ্তানিকৃত রেশমের তিন ভাগের চারভাগ উৎপন্নহতো রাজশাহী বা নাটোর জমিদারিতে।[৭২] বড় বড় জমিদারদের বিলাসী জীবনযাপনের জন্য সমাজের অর্থের গতিশীলতা পায়। জমিদারদের পারিবারিক জীবন ছিল জাঁকজমকপূর্ণ। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে তারা অকাতরে ব্যয় করতো। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি অনুষ্ঠানে তারা অনেক ব্যয় করতো ও অনেক সময় ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়তো।[৭৩] জমিদাররা আরেক এলাকার জমিদারদের সাথে প্রতিযোগিতা করে তাঁদের প্রাসাদ ও ভবন সাজাতো। জমিদারদের বিলাসদ্রব্য ব্যবহার ও সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ভবন নির্মাণ কর্মকাণ্ড দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রভাব ফেলে।[৭৪] দিঘাপতিয়া জমিদার শরৎকুমার শিল্প মনস্ক জমিদার ছিলেন। বড়াল নদীর তীরবর্তী দয়ারামপুরে তিনি চিনিকল স্থাপন করেন। শরৎকুমার তার মায়ের নামে করা দ্রবময়ী ফার্ম থেকে উৎপন্ন ইক্ষু মাড়াই করে চিনি উৎপাদন করতেন। বাংলাদেশে যখন কোন চিনি কল ছিল না তখন তিনি দয়ারামপুরে চিনিকল স্থাপন করেন। শরৎকুমার বাংলাদেশে চিনি শিল্পের জনক বলা হয়।[৭৫] শরৎকুমারের চিনিকল স্থাপনের কিছুকাল পর নর্থবেঙ্গল সুগার মিল স্থাপিত হয়। শরৎকুমার দিনাজপুরের হিলিতে তার অকাল প্রয়াত কন্যা অপর্ণা রায়ের নামে একটি রাইসমিল স্থাপন করেন। তছাড়া পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জেলায় তিনি একটি কয়লা খনি স্থাপন করে কয়লা উৎপন্ন করতেন। এ কয়লা খনিতে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন শরৎকুমারে চতুর্থ পুত্র কুমার অরুণ প্রকাশ রায়।[৭৬] রাজশাহী এসোসিয়েশনের সহায়তায় রাজশাহীতে যে কৃষি ফার্ম স্থাপন করা হয় সেখানে দিঘাপতিয়া রাজা প্রমদানাথ আশি বিঘা জমি প্রদান করেন।[৭৭] রাজশাহী মেডিকেল কলেজ এ জমিতেই পরবর্তীকালে স্থাপন করা হয়। মৌমাছি পালন কেন্দ্র স্থাপনের

---

[৬৯] মোঃ মকসুদুর রহমান, *নাটোরের মহারাণী ভবানী* (ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৯), পৃ. ৯০।

[৭০] বিমল প্রসাদ রায়, প্রতুলপতি লাহিড়ী ও নির্মল চন্দ্র বিশি, *নাটোরের কথা ও কাহিনী* (কলকাতা: নাটোর মহকুমা সম্মিলনী, ১৯৮১), পৃ. ১৪৫।

[৭১] তদেব, পৃ. ১৪৮।

[৭২] শিরিন আখতার, "নবাবি আমলে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমিভিত্তিক সমাজ," সিরাজুল ইসলাম সম্পা., পৃ. ৪৮।

[৭৩] তদবে, পৃ. ৪৯।

[৭৪] তদেব।

[৭৫] কে আই আই, মোঃ সফিকুল ইসলাম, উপরেজিস্ট্রার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী। তারিখ: ২১ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি.

[৭৬] কে আই আই, তদেব।

[৭৭] মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ''জমিদারী প্রথা ও সমাজ উন্নয়নঃ রাজশাহী জমিদারদের উদাহরণ'', পৃ. ১৮০।

জন্য জমিদার প্রমদানাথ রাজশাহীতে চৌত্রিশ বিঘা জমি প্রদান করেন। রাজশাহী শহরের বিকাশে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নাটোরে দিঘাপতিয়া জমিদারদের ভূমিকা অপিরসীম।

## মহাল ইজারা ও খেয়াঘাট পারাপারে ভূমিকা:

নাটোরের জমিদারদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম নবাবি বাংলার অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে। জমিদারদের দ্বারা আহোরিত রাজস্ব নবাবি বাংলার অর্থনীতিকে সচল ও গতিশীল রাখে। সমসাময়িক সময়ে জমিদাররা অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে তুলনামুলক কম ভূমিকা রাখে কেননা তারা শাসনকার্য পরিচালনা ও আয়েশী জীবনযাপনের উপর মনোযোগ বেশি দেয়। রাণী ভবানী যখন তাঁর সুবিশাল জমিদারি পরিচালনা করেন তখন অধিক রাজস্ব আদায় করতেন এবং তা দিয়ে কেন্দ্রে যেমন পাঠাতেন তেমনি জনহিতকর কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বাংলার নবাবকে নাটোরের জমিদারগণ রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করতেন। মুর্শিদকুলি খানের দেওয়ান ছিলেন রঘুন্দন এবং অধিক রাজস্ব আদায়ে দক্ষতার পরিচয় দেয়ার কারণেই তাকে নবাবের দেওয়ান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। রঘুনন্দন তার ভাই রামজীবনের নামে নতুন নতুন এলাকা বন্দোবস্ত করিয়ে নেন যদিও রামজীবন অধিক মাত্রায় সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের ছিলেন। রামজীবন তার জমিদারির এলাকা বিস্তৃতির দিকে বেশি মনোনিবেশ করেন। ১৭৭০ সালে বাংলায় ভয়াবহ যে মন্বন্তর দেখা দেয় সে সময় কোম্পানি রাজস্ব মওকুফ না করলেও রাণী ভবানী প্রজাদের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন। ১৭৯৩ সালে জমিদারি নতুন করে বন্দোবস্ত করা হলে জমিদারদের প্রশাসনিক ক্ষমতা খর্ব হলে রামকৃষ্ণ ব্যথিত হন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে নাটোরের জমিদাররা অর্থনৈতিক ভূমিকা বেশি করে ভূমিকা রাখলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর তা ব্যাহত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কৃষির উন্নতির কথা থাকলেও কৃষির উন্নয়ন সেভাবে ঘটেনি।

## উপসংহার:

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নাটোরের জমিদারদের বেশ কিছু ভূমিকা রাখার চিত্র পাওয়া যায়। নবাবি আমলের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে তাদের অবদান রয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লন্ডনের ভূমিব্যবস্থার আলোকে করা হয়। প্রাচ্য দেশে কৃষিতে বিপ্লব ঘটানোর জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের সাথে করা হয় কিন্তু আদতে বাংলায় তেমনটা ঘটেনি। জমিদাররা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের উন্নয়ন ও বিলাসি জীবনে মনোযোগ দিয়েছে। নাটোরের জমিদারদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা কিছুটা অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন। তবে ব্যাপক হারে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে তেমনটা দেখা যায় না। নাটোরের সব জমিদাররা একই রকম ছিল না। তবে নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে তারা তৎপর থেকেছেন। অর্থনৈতিক কার্যক্রমে দিঘাপতিয়া জমিদারদের অংশগ্রহণ তুলনামূলক বেশি লক্ষ্য করা যায়। জমিদারদের শাসনামলে কৃষক ও কৃষি ছিল অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। নাটোর ও রাজশাহী ছিল শহর এলাকা। নদী তীরবর্তী বা বড় কোন বটগাছের নিচে হাট বসতো। সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন গ্রামীণ হাট বসতো। নাটোর ও আশে পাশে এরকম অনেক হাট ও বাজার ছিল। কালক্রমে এসব হাট ও বাজার বড় শহরের ন্যায় গড়ে ওঠে। দিঘাপতিয়া বাজার, পুঠিয়াবাজার, ধরাইল বাজার, চৌগ্রাম, করচমারিয়া, জোয়ারি বাজারসহ অনেক বাজার মূলত জমিদারদের বসবাস হওয়ার কারণে গড়ে ওঠে। এসব স্থানের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা নদী কেন্দ্রীক হলেও পরবর্তীকালে রাস্তার সাথে সংযুক্ত হয়। কাঁচা রাস্তাগুলো পাকা রাস্তাতে রূপান্তরিত হতে থাকে। নাটোর ও রাজশাহীর যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে জমিদারদের সংযোগ অব্যাহত থাকে। নাটোর কেন্দ্রিক জমিদাররা তাদের জমিদারি সুষ্ঠুভাবে দেখভাল করার জন্য এসব রাস্তাগুলো গড়ে তোলে। দিঘাপতিয়া জমিদাররা এসব এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নাটোরের বেশ কিছু জমিদার ব্রিটিশ কর্তৃক অধিকহারে খাজনা প্রদান ও জমিদারি ঠিকঠাক পরিচালনা জন্য খেতাব বা উপাধি পেয়েছে। ব্রিটিশরা সাধারণ প্রজাদেও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য জমিদারদের উপাধি দিয়ে জনকল্যাণকামী কাজে উৎসাহিত করেছে। তারপরও তাদের মূল লক্ষ্য ছিল রাজস্ব আদায়। জমিদাররা পূর্ণমাত্রায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে মনোনিবেশ করলে হয়তো এসব এলাকা আরো উন্নত দেখা যেত। তৎকালীন সমাজ বাস্তবতায় জমিদারদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। কারণ জমিদাররা ছিল সমাজেরই অংশ। নাটোরকেন্দ্রিক জমিদাররা নাটোর ও রাজশাহীর উন্নয়নে যতটুকু ভূমিকা রেখেছেন তা এই এলাকার উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে।